মেধা অমেধার জিন চর্চা

স্বপন শীল

১৯৫৩ সালে বিজ্ঞানী ওয়াট্‌সন এবং ক্রিক কর্তৃক ডিঅক্সিরিবোনিউক্লিক এসিড (DNA) ও রিবোনিউক্লিক এসিড (RNA) এর গঠন বৈচিত্র্য আবিষ্কারের পর অনুজীববিদ্যা (Molecular Biology) এবং জিনবিদ্যা (Genetics) - এর বিকাশ খুব দ্রুত ঘটেছে। এই দুটি বিষয়ে ক্রমাগত গবেষণার ফলে ইতিমধ্যে যে বিশাল জ্ঞানভান্ডার তৈরী হয়েছে তা থেকে এটা স্পষ্ট যে কোন জীব প্রজাতির যাবতীয় গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে জিনের মধ্যে। এজন্য আলোচনা এবং চর্চায় জিন এতই গুরুত্বপূর্ণ যে গবেষণার অঙ্গন ছাড়িয়ে জিন সম্পর্কে কিছু অতিকথনও তৈরী হয়েছে। মেধা - বুদ্ধির মত আচরণগত বৈশিষ্ট্যও জিনের মধ্যে নিহিত' — এরকমই একটা অতিকথন। এরকম ধারণার বিস্তারে কিছু কিছু বিজ্ঞানীরও ইন্ধন আছে। হাতের কাছে বিজ্ঞানী ওয়াট্‌সনই একজন বড় উদাহরণ। তিনি বিশ্বাস করতেন কালো মানুষরা জন্মগতভাবেই সাদা মানুষদের চাইতে কম বুদ্ধিসম্পন্ন, অর্থাৎ বুদ্ধি-মেধা-নামক বৈশিষ্ট্যটি জিনের মধ্যে নিহিত। বাস্তবে এরকম ধারণার সমর্থনে জিন সম্পর্কিত তথ্য ভান্ডার থেকে কোন তথ্য বা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় কিনা সেটাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

জিন কি?

জিন মূলতঃ DNA অণু। অতএব জিনের পরিচয় জানতে হলে জানতে হবে DNA এর পরিচয়। DNA অন্যান্য রাসায়নিক যৌগের মত নয়। এটাকে বলা যেতে পারে অনেকগুলি যৌগের অণু দিয়ে তৈরী একটি বৃহৎ অণু। প্রথম ধাপে একটি ফসফেট (মূলক), একটি ডিঅক্সিরিবোস সুগার অণু ও একটি নাইট্রোজেন ক্ষার অণু একত্র যুক্ত হয়ে একটি বৃহৎ অণু তৈরী হয়। একে নিউক্লিওটাইড বলে। নাইট্রোজেন ক্ষার যৌগ পাঁচ রকমের, যথা অ্যাডেনাইন (A), গনাইন (G), সাইটোসাইন (C), থায়ামিন (T) ও ইউরাসিল (u)। এদের মধ্যে A,G,C ও T DNA তৈরীতে প্রয়োজন এবং RNA তৈরীতে প্রয়োজন A,G,C ও u। অতএব DNA এর ক্ষেত্রে চার রকমের নিউক্লিওটাইড হতে পারে। দ্বিতীয় ধাপে দুটি নিউক্লিওটাইড (A-T অথবা C-G) আড়াআড়িভাবে যুক্ত হয়ে একটি নিউক্লিওটাইড জোড়া গঠন করে। তৃতীয় ধাপে অসংখ্য নিউক্লিওটাইড জোড়া লম্বালম্বিভাবে যুক্ত হয়ে নিউক্লিওটাইড - জোড়ার একটি শৃংখল (Chain) তৈরী করে। এটাই DNA অণু।

জিন কোথায় থাকে ?

ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া প্রভৃতি অতিক্ষুদ্র জীবকে বাদ দিলে এই পৃথিবীতে যত জীব প্রজাতি রয়েছে তাদের প্রত্যেকেই জীবকোষ দিয়ে তৈরী। ইঁটের উপর ইঁট সাজিয়ে যেমন একটি বাড়ী তৈরী হয় তেমনি অসংখ্য জীবকোষ সজ্জিত হয়ে একটি জীবদেহ তৈরী হয়। একটি জীবকোষের প্রধানত: তিনটি অংশ, যথা কোষপ্রাচীর, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস। কোষের কেন্দ্রস্থলে একটি গোলাকার ঘন অংশ থাকে। একে নিউক্লিয়াস বলে। নিউক্লিয়াসের চারপাশে জেলির মত পদার্থকে সাইটোপ্লাজম বলা হয় যা কোষপ্রাচীর দ্বারা আবৃত থাকে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে সরু সুতোর মত এক ধরণের পদার্থ থাকে। একে ক্রোমোজোম বলা হয়। এই ক্রোমোজোমের মধ্যে জিনের অবস্থান। মরুভূমি ও বালুকণার মধ্যে যেমন সম্পর্ক, ক্রোমোজোম ও জিনের মধ্যেও ঠিক তেমন সম্পর্ক। ক্রোমোজোম একটি নাম মাত্র। অসংখ্য জিন পরপর লম্বালম্বিভাবে সজ্জিত হয়ে একটি আকার তৈরী করে। এই আকারটাই ক্রোমোজোম। আকারের কোন নির্দিষ্টতা নেই। বিভিন্ন রকম ক্রোমোজোম হতে পারে।

জিন কীভাবে থাকে ?

জিন ক্রোমোজোমে সুনির্দিষ্ট নিয়মে অবস্থান করে। বস্তুত: ক্রোমোজোম এবং জিনই একটি প্রজাতির পরিচয় বহন করে। কোন একটি প্রজাতির যে কোন জীবদেহের যে কোন কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট। এই সংখ্যাটিই উক্ত প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যা। উদাহরণ - হিসেবে মানুষ প্রজাতির কথাই ধরা যাক্। পৃথিবীতে কালো-সাদা, লম্বা-খাটো, রোগা-মোটা, হিন্দু-মুসলিম, ব্রাহ্মণ-শুদ্র প্রভৃতি মানুষ যেখানে যত থাকুক না কেন প্রত্যেকের শরীরে প্রতিটি জীবকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে। এটা মানুষ প্রজাতির একটা পরিচয়। কিন্তু শুধু এই সংখ্যা দিয়ে পরিচয় যথেষ্ট নয়। পৃথিবী অসংখ্য জীবপ্রজাতির বাসভূমি। অতএব প্রতিটি প্রজাতির ক্রোমোজোম-জোড়ার সংখ্যাকে যদি অন্য সবার চাইতে পৃথক হতে হয় তাহলে কোন কোন প্রজাতির ক্রোমোজোম-জোড়ার সংখ্যা দাঁড়াবে লক্ষতে বা কোটিতে। জৈব বিবর্তন এভাবে হয়নি। একটি প্রজাতির ক্রোমোজোম-জোড়ার সংখ্যা নির্দিষ্ট হলেও জৈব বিবর্তনের পথে অন্যান্য প্রজাতি থেকে তার স্বাতন্ত্র্য বা পার্থক্য সূচীত হয়েছে ক্রোমোজোমের গঠন ও আকৃতিতে এবং জিনের সংখ্যা ও গঠনে। অতএব একাধিক প্রজাতির ক্রোমোজোম-জোড়ার সংখ্যা একই রকম হতে পারে, কিন্তু ক্রোমোজোমের গঠনও আকৃতি এবং জিনের সংখ্যা ও গঠন একই রকম হবে না। বিষয়টি আমরা উদাহরণের সাহায্যে বোঝবার চেষ্টা করব। ধরা যাক্, মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের কথা। জোড়া ক্রোমোজোমের গঠন, আকৃতি ও জিন সংখ্যা একই। জোড়ার একটি মায়ের

ছাড়াও হিন্দুস্থানে আঞ্চলিকতার সঙ্গে জাত-পাতের সংমিশ্রণ আপামর ভারতবাসীকে ক্ষেপিয়ে তোলার একটি উপকরণ হতে পারে। বিশ্বায়নের যুগে মুক্ত পরিবেশের সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রশক্তি যত দুর্বল হচ্ছে তত এইসব প্রয়াস পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। ভারতে বৈচিত্র্যকে কয়েকটি মূল দ্বন্দ্বে ভাগ করে, তাদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত সৃষ্টির ছক কষা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, এইরকমের বিভাজন স্বৈরতন্ত্রের আগমনের পথ তৈরী করে।

ভারতে যেখানে ১২০ কোটির বেশি মানুষের বাস, কয়েক হাজার ভাষা ও উপভাষা বিরাজ করে; রয়েছে ৭০০টির বেশি প্রাচীন জনগোষ্ঠী, যাদের ইতিহাস প্রায় দশ হাজার বছরের পুরনো, সেখানে মাত্র ৫৭১টি ব্যক্তির জিন নমুনা সংগ্রহ করে যারা নাকি ৭৩টি ভাষা ও জাতের প্রতিনিধিত্ব করছে, ডেভিড রিখ ও লালজি সিং এই ধরনের পল্লবগ্রাহী গবেষণা কি করে প্রকাশ করেন সেটাই একটা রহস্য। এই ৭৩টি ভাষার মধ্যে ৭১টি ভারতের থেকে ও দুটি পাকিস্তান থেকে নেওয়া। তাতেই গোটা উপমহাদেশের মানবির জিনবৈচিত্র্য এরা নাকি ধরে ফেলেছেন।

আমেরিকান জার্নাল অব হিউম্যান জেনেটিকসে ২০১৩ সালে সদ্য প্রকাশিত এদের গবেষণাপত্রে এরাই দাবি করেছেন যে ভারতে ১৯০০ বছর আগে, অন্তত দুহাজার বছর ধরে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে অবাধ মেলামেশা ও বিবাহ সম্পর্ক নাকি চালু ছিল। তার পরের বছরগুলিতে যা বন্ধ হয় এবং জাতিভেদ. চালু হবার ফলে আজকে জাতপাতের জিনগত ভেদাভেদ গড়ে উঠেছে, যেখানে কোন গোষ্ঠী নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক বরদাস্ত করে না। এটাই পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় বিবাহ নিষ্পন্ন করার যুক্তি।

এই গবেষকরা পাকিস্তানের পাঠানদের মধ্যে উত্তরের ৭১ শতাংশ বিশুদ্ধতা খুঁজে পান, এবং দক্ষিণের পানিয়া গোষ্ঠীর মধ্যে যা নেমে এসেছে মাত্র ১৭ শতাংশে, যা নগণ্য বললেই চলে। তবে, বেশিরভাগ জাত নাকি রয়েছে এর মাঝামাঝি।

আসলে, এই গবেষকরা বেশ কিছু প্রচলিত ধারণার সপক্ষে দাঁড়িয়ে এইসব সংখ্যাতত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন যা ঠান্ডা মাথায় অনেকটা খেটেখুটে সাজানো, পূর্বপরিকল্পিত। অন্য অনেক জিনতাত্ত্বিক এই মত ব্যক্ত করেছেন।

এই গবেষণার ফলাফল এ ভাবে পেশ করা হয়েছ যেন গবেষকরা জাতিভেদ যে সাম্প্রতিক ও চিরাচরিত ভারতীয় ঐতিহ্য নয় এমন প্রগতিশীল সিদ্ধান্ত প্রচার করছেন যাতে আসল দুরভিসন্ধি ঢাকা দেওয়া যায়। একেই বলা চলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার

চেষ্টা। জাত নামক এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভাজনকে এভাবে জীববিজ্ঞানের বৈধতা দেওয়া হচ্ছে।

জাত-নির্মাণ ও জাত নির্ণয়

আর একটি-দুটি কথা বলেই এই আলোচনার উপসংহার টানতে চাই।

১। মৌমাছিদের, পিঁপড়েদের মধ্যে জাত জিনগত নির্মাণ যা তাদের সামাজিক বা যৌথ আচরণের ভিত্তি। ওদের যে অর্থে সামাজিক প্রাণী বলা হয়, মানুষ সেইভাবে সামাজিক নয়। মানুষের সামাজিকতা জিনগত নয়, তা সমাজনির্মিত। এই সোজা কথাটা এখন জিনচর্চার নামে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

২। শুধু বিভেদ জাগ্রত রাখা নয়, আজকের জিনকেন্দ্রিক আপাত উৎকেন্দ্রীকতার আরেক কারণ জিন-প্রযুক্তির প্রসার সুনিশ্চিত করা এবং সেই প্রযুক্তির বলে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটানো।

৩। জিনপ্রযুক্তি, অভাবনীয় অদৃশ্য শক্তির উৎস হিসেবে উঠে আসছে। পারমাণবিক অস্ত্রে চেয়েও উন্নততর মারক-অস্ত্র আজ জিনপ্রযুক্তি দিয়ে তৈরী করা সম্ভব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শতবর্ষ এগিয়ে আসছে। পরমাণু অস্ত্র তামাদি হয়ে আসছে। তার চেয়েও অনেক অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠছে হরেক রকমের জিন-অস্ত্র, জৈব অস্ত্র।

৪। ক্ষমতা ও সম্পদের অভাবনীয় কেন্দ্রীভবনের পাশাপাশি জাতি, জাত এসব নিয়ে রাজনৈতিক সংঘাত বিশ্বায়নের যুগে ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে।

সুতরাং জিন ও জাতের মতাদর্শের নবজাগরণ ঘটাবার যে কোন অপকৌশলের বিষয়ে আমাদের আজ অতীতের চেয়েও আরো বেশি সতর্ক থাকতে হবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. Unesco Documet, The Race Question, 18th July, 1950, Revised on 1951, 1967, 1978. Declarations

২. জিন : ভাবনা, দুর্ভাবনা, তুষার চক্রবর্তী(অবভাস), ২য় সংস্করণ, ২০১০

৩. জিন, বুদ্ধি, জাতি, প্রগতি, চেতনা লহর, ২০১১

৪. D Reich, et al, Reconstructing Indian Population History, Nature, Vol.461, P.489-94 (2009)

৫. P Moorjani et al, Genetic evidence for recent population mixture in India, American Jr of Human Genetics, Vol. 93, P. 1-17 (2013)

থেকে আসে অপরটি পিতার থেকে আসে। ক্রোমোজোমে জিনগুলির অবস্থান নির্দিষ্ট। ধরা যাক্, ৩নং ক্রোমোজোম জোড়ার প্রত্যেকটিতে পরপর দশটি অবস্থান আছে এবং প্রথম অবস্থানে যে জিনটি আছে তার জিন A। অতএব প্রতিটি মানুষের প্রতিটি কোষে ৩নং ক্রোমোজোম জোড়ার প্রথম অবস্থানে A নামক জিন থাকবে। এভাবে প্রতি জোড়া-ক্রোমোজোমে অবস্থান সংখ্যা নির্দিষ্ট এবং প্রতিটি অবস্থানে একটি নির্দিষ্ট জিনের আশ্রয়। অন্যান্য প্রজাতিতেও বিষয়টা একইরকম, অর্থাৎ ক্রোমোজোমের গঠন, আকৃতি, অবস্থান সংখ্যা ও প্রতিটি অবস্থানে আশ্রিত জিন — এই সব মিলিয়ে কখনই দুটি ক্রোমোজোম সদৃশ হয়না। জৈব বিবর্তনের পথে এভাবেই একটি প্রজাতি অন্যান্য প্রজাতি থেকে পৃথক হয়েছে।

জিন কেন অন্য সকল রাসায়নিক যৌগ থেকে পৃথকঃ

জিন তথা DNA অনু অন্য যে কোন রাসায়নিক যৌগ থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের জন্য পৃথক। একটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যকে বলা যেতে পারে জিনের স্ব বিভাজন (Self replication) প্রক্রিয়া। একটি DNA অণু যদি তার গঠনগত উপাদান তিনটির সরবরাহ ঠিক ঠিকভাবে পায় তাহলে একটি DNA অণু স্ববিভাজন প্রক্রিয়ায় নিজেই নিজের প্রতিলিপি তৈরী করতে সক্ষম। প্রথমে DNA অণুটি লম্বালম্বিভাবে একসারি নিউক্লিওটাইডের শৃংখলে বিভক্ত হয়। দ্বিতীয় ধাপে প্রতিটি শৃংখল তার চারপাশ থেকে ডিঅক্সিরিবোস সুগারের অণু, ফসফেট মূলক এবং নাইট্রোজেন ক্ষারের অণু সংগ্রহ করে একটি পরিপূরক শৃংখল তৈরী করে নিজের সাথে যুক্ত করে নেয়। এভাবে একটি DNA অণু থেকে দুটি DNA অণু তৈরী হয়। DNA অণু স্ববিভাজন বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি ক্রোমোজোম দুটি ক্রোমোজোমে বিভক্ত হতে পারে এবং একটি ক্রোমোজোম দুটি ক্রোমোজোমে বিভক্ত হতে পারার জন্য একটি কোষ বিভাজিত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হতে পারে। কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব না থাকলে একটি জীব দেহ থেকে আর একটি অপত্য জীবদেহের জন্ম এবং জন্মের পর অপত্যর পরবর্ত্তী পরিবর্ধন (Growth) সম্ভব হোত না।

জিন কি করে ?

কোষবিভাজন ছাড়া জিনের একটিই নিয়মিত কাজ এবং তা হোল প্রোটিন তৈরী করা। একটি জীবদেহে অসংখ্য শারীরবৃত্তীয় কাজ আছে। প্রতিটি কাজে প্রোটিনের প্রয়োজন। কাজ ও প্রয়োজনের ধরণ অনুযায়ী প্রোটিনের বিভিন্ন নাম। কোন শ্রেণীর নাম উৎসেচক (Enzyme), কোন শ্রেণীর নাম হরমোন, কোন শ্রেণীর নাম নিউরো প্রোটিন ইত্যাদি। মানুষের শরীরে সব মিলিয়ে প্রয়োজনীয় প্রোটিনের সংখ্যা বেশ কয়েক

হাজার। অনেক প্রোটিনের খবর এখনও জানা নেই। যাই হোক্, একটি জিন একটিই প্রোটিন তৈরী করে। ২০ রকমের অ্যামাইনো এসিড এবং ৬৪ টি জিন - সংকেত (Genetic Code) - এর সাহায্যে কোষস্থ জিনসমূহ এই প্রোটিনগুলি তৈরী করে। এখন প্রশ্ন হোল সব কোষেই তো ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম সহ সব জিন থাকে। তাহলে কি প্রতি কোষেই সব প্রোটিন তৈরী হয়? অবশ্যই নয়। এ ব্যাপারে কোষেদের মধ্যে বেশ সুশৃংখলভাবে দায়িত্ব ভাগ করা আছে। যেমন অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষ শুধু ইনসুলিন হরমোন তৈরী করবে বা থাইরয়েড গ্রন্থীর কোষ থাইরয়েড হরমোন তৈরী করবে .... ইত্যাদি বিটা কোষে বা থাইরয়েড গ্রন্থীর কোষে অবশিষ্ট জিনগুলি নিস্ক্রিয়। এভাবে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রোটিন তৈরীর দায়িত্ব নির্দিষ্ট এবং তার জন্য জিনও নির্দিষ্ট। কেউ কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না।

জিন কীভাবে বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে ঃ

আমরা পূর্বেই বলেছি জীবদেহের যাবতীয় গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য জিনের মধ্যে নিহিত। জিন যে কোন বৈশিষ্ট্যকেই নিয়ন্ত্রণ করে প্রোটিন তৈরীর মাধ্যমে। রক্তে কতটা গ্লুকোজ থাকবে জিন তা নিয়ন্ত্রণ করে ইনসুলিন নামক প্রোটিন তৈরীর মাধ্যমে। এটা একটা শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য। একইভাবে গায়ের রঙ কেমন হবে, শরীরের দৈর্ঘ্য কেমন হবে, চোখের মণির রঙ কেমন হবে — প্রভৃতি গঠনগত বৈশিষ্ট্যও জিন প্রোটিন তৈরীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এই দুধরণের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রনের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিবর্তনীয়তা (Variation) প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। যেমন ইনসুলিন উৎপাদক জিনের কথাই ধরা যাক্। রক্তে গ্লুকজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ শুধু মানুষ প্রজাতির ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক। কোটি কোটি বছর ধরে জিনটি বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে একইরকম রয়েছে, এর কোন মিউটেশন ঘটেনি বা যদি কোন প্রজাতির কোন জীবদেহে কখনও এই জিনে মিউটেশন ঘটেও থাকে তাহলে সেই জীবসদস্যটি জন্মের পর অচিরেই তার অস্তিত্ব হারিয়েছে। অর্থাৎ শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিনের মিউটেশন প্রায় সবক্ষেত্রেই প্রাণঘাতী (Lethal)। বিপরীতে গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে চিত্রটা ভিন্ন। একই গঠনগত বৈশিষ্ট্য একাধিক রকমের হতে পারে। যেমন মানুষের গায়ের রঙ — সাদাও হতে পারে কালও হতে পারে। এভাবে বিভিন্ন গঠনগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিবর্তনীয়তা দেখা যায়। অতএব একই গঠনগত বৈশিষ্ট্যের জন্য একাধিক জিনের অস্তিত্ব থাকা স্বাভাবিক। তবে কোন একটি বৈশিষ্ট্যের জন্যে কোন নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমের যে অবস্থানটি বরাদ্দ সেই অবস্থানেই সেই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত সব জিন থাকবে। তাহলেতো মানুষের মধ্যে অথবা অন্য কোন জীবদেহে একটি গঠনগত বৈশিষ্ট্যের

জন্য জোড়া ক্রোমোজোমের সমঅবস্থানে দুটি জিন একইরকম নাও হতে পারে। হ্যাঁ, গঠনগত বৈশিষ্ট্যসমূহের ক্ষেত্রে এটাই বাস্তব। কিন্তু দুটি জিনের মধ্যে একটি জিন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে। অপরটি নিষ্ক্রিয় থাকবে। কখনও যদি একই বৈশিষ্ট্যের দুটি জিনই একই রকম হয় তাহলে দুটির যে কোনটি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

জৈব বিবর্তনের পথে গঠনগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত জিন গুলিতে যে সব মিউটেশন বা পরিবর্তন ঘটেছে তার সবগুলি প্রাণঘাতী ছিল না। এজন্যই অনেক মিউটেশন টিকে গেছে। যে কারণে গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তনীয়তা দেখা যায়।

মানব জেনম

মানুষের যে কোন কোষে মোট যে পরিমাণ DNA বা জিন থাকে তাকে একত্রে জেনম বলে। মানব জেনমের সমস্ত জিনকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। মোট কার্যকরী জিনের সংখ্যা প্রায় ২৫০০০ এবং অকার্যকরী বা Pseudo জিনের সংখ্যা ২০,০০০ এর বেশী। কার্যকরী জিনের দ্বিতকরণ বা Duplication ঘটার ফলে সিউডো জিনের জন্ম। একটি সিউডো জিন অবশ্যই কোন না কার্যকরী জিনের প্রতিলিপি। একটি কার্যকরী জিনে গড়ে প্রায় ২৭০০০ জোরা নিউক্লিওটাইড থাকে। জিনেরও আবার পুরো অংশটা কার্যকরী নয়। একটা জিনের যে যে অংশ কার্যকরী, অর্থাৎ যে যে অংশের নিউক্লিওটাইড জোড়া প্রোটিন উৎপাদন করে তাকে এক্সন বলে। একটি জিনে গড়ে এক্সনের সংখ্যা ১০.৪ এবং একটি এক্সনে গড়ে ১৪৫ টি জোড়া নিউক্লিওটাইড থাকে, অর্থাৎ একটি জিনে গড়ে ২৭০০০ জোড়া নিউক্লিওটাইড থাকলেও প্রোটিন উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে মাত্র ১৫০০ এর মত জোড়া নিউক্লিওটাইড। অতএব সব মিলিয়ে মানুষের একটি কোষে ৩৭৫০০০০০ জোড়া নিউক্লিওটাইড প্রোটিন উৎপাদনে সক্রিয় হতে পারে, কিন্তু হয় না। একটি প্রোটিন উৎপাদনের জন্য যে কটি জোড়া নিউক্লিওটাইড প্রয়োজন সেই ক'টি জোড়াই একটি কোষে সর্বদা সক্রিয় থাকে।

একটি নির্দিষ্ট অঙ্গ সাধারণত একটিই নির্দিষ্ট দায়ীত্ব পালন করে এবং এজন্য অঙ্গটি যত কোষ দ্বারা গঠিত তারা সবই একইরকম হয় এবং কোষগুলির প্রত্যেকটিই একটি প্রোটিন তৈরী করে। অর্থাৎ কোষগুলিতে - ২৫০০০ জিনের মধ্যে একটি জিনই সক্রিয়। বাকী ২৪৯৯৯ টি জিন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। কিছু কিছু অঙ্গ আছে যাদের শারীরবৃত্তীয় উদ্দেশ্য একই রকম হলেও উদ্দেশ্য পালনে একাধিক প্রোটিন প্রয়োজন। ফলতঃ অঙ্গটি বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন শ্রেণীর কোষের সজ্জা থাকে এবং এক এক অংশের সজ্জায় এক এক রকম প্রোটিন তৈরী হয়। মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয় প্রভৃতি এধরণের যৌগিক অঙ্গের উদাহরণ।

জিন ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য (Behavioural Character)

এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা থেকে জিন সম্পর্কে আমরা যতটুকু জেনেছি তা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে একমাত্র শারীরবৃত্তীয় ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যের সাথেই জিনের সম্পর্ক। আচরণগত বৈশিষ্ট্যের সাথে জিনের কোন সম্পর্ক নেই। বাস্তবেও এটা যুক্তিযুক্ত। জিন যদি প্রোটিন উৎপাদনের মাধ্যমে আচরণগত বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত তাহলে অভিযোজন শব্দটি অর্থহীন হয়ে যেত। বিবর্তিত হওয়ার পর একটি প্রজাতি তার অভিযোজন তৈরী করে। অভিযোজন তৈরী এবং তা অনুশীলনের মধ্য দিয়ে একটি প্রজাতির আচরণগত বৈশিষ্ট্য তৈরী হয়। যদি কোন প্রজাতি তার বিবর্তনের সাথে সাথে অথবা অব্যবহিত পরে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে একান্ত প্রয়োজনীয় অভিযোজন তৈরী করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সেই প্রজাতির কাছে একমাত্র বিকল্প পথ অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া। এভাবে অসংখ্য প্রজাতি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। বিপরীতে অভিযোজনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যদি জিন থাকত তাহলে অভিযোজন তৈরীতে কখনই ব্যর্থ হওয়ার প্রশ্ন উঠত না। অতএব আচরণগত বৈশিষ্ট্যের সাথে জিনের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকতে পারে না। কোন প্রজাতি তার গঠনগত ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের সাহায্যেই অভিযোজন নির্মাণ করে, কিন্তু অভিযোজন কখনই গঠনগত বা শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য নয়।

এ বিষয়ে আরও একটি যুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে। একবার অভিযোজন তৈরী হলেই তা স্বত:স্ফূর্তভাবে কোন প্রজাতির সদস্যরা অনুশীলন করতে পারে না। প্রজাতির প্রতিটি সদস্যকে অভিযোজন নির্মাণ পদ্ধতি অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে শিখতে হয়। বাসা তৈরী করতে পারে এমন পাখীর ডিম ফুটে বাচ্ছা হওয়ার সাথে সাথেই যদি সেই বাচ্ছাকে পৃথক পরিবেশে বড় করা হয় তাহলে পরিণত বয়সে সেই পাখীর পক্ষে আর বাসা তৈরী করা সম্ভব নয়। কোন জিন সংশ্লিষ্ট প্রোটিনের সাথে যদি পাখীর বাসা তৈরীর বিষয়টি সম্পর্কিত হোত তাহলে বাসা তৈরী করা শেখার দরকার হোত না, স্বত:স্ফূর্তভাবেই পাখী বাসা তৈরী করতে পারত।

মেধা তথা বুদ্ধি ও জিন

আমরা প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করেছি মেধা, বুদ্ধি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি আচরগত বৈশিষ্ট্য। এটা মেনে নিলে আর ব্যাখ্যা বা আলোচনার কোন প্রয়োজনই থাকে না। অতএব সহজ পথে বিচরণ না করে আমাদের বুঝে নেওয়া প্রয়োজন মেধা, বুদ্ধি, প্রতিভা ইত্যাদিকে গঠনগত বা শারীরিক বৈশিষ্ট্য চলা যায় কিনা। গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না কারণ এই শব্দগুলির নামে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই। অতএব

ভেবে দেখতে হবে এগুলি শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য কিনা। যে কোন শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য বেশ কিছু শর্তের অধীন। প্রথমত: শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য প্রজাতির প্রতিটি সদস্যের কাছে সমানভাবে প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত: শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যকে চলমান রাখার জন্য কোন চর্চা বা অনুশীলনের প্রয়োজন থাকে না। তৃতীয়ত: শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপাদান শরীরের মধ্যেই সংশ্লেষিত হয় এবং এজন্য শরীর নিরপেক্ষ পরিবেশের কোন ভূমিকা প্রায় নেই বল্লেই চলে। মেধা ও বুদ্ধির অবস্থান এই শর্তগুলির ঠিক উল্টোদিকে। প্রথমত: সব মানুষের বুদ্ধি ও মেধা সমান নয়, অর্থাৎ সব মানুষের কাছে বুদ্ধি ও মেধা সমানভাবে প্রয়োজনীয় নয়। দ্বিতীয়ত: চর্চাও অনুশীলন ছাড়া বুদ্ধি ও মেধার বিকাশ ঘটে না। তৃতীয়ত: মেধা ও বুদ্ধি যে সব বিষয়কে কেন্দ্র করে বিকশিত হয় তার সবগুলির অবস্থানই শরীর নিরপেক্ষ পরিবেশে। অতএব মেধা, বুদ্ধি, প্রতিভার মত বিষয়গুলিকে শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখারও কোন সুযোগ নেই এবং অনিবার্যভাবেই মেধা ও বুদ্ধি মানুষের আচরণগত বৈশিষ্ট্য।

উপসংহার

বুদ্ধি, মেধা — শব্দগুলি শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, অন্যান্য প্রাণী প্রজাতিতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিশেষ করে যে সব প্রাণী প্রজাতিরা প্রকৃতি-পরিবেশের উপাদানকে পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের অভিযোজন গড়ে তুলেছে তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও মেধার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। কোন প্রজাতি এ ধরণের অভিযোজন গড়ে তোলে প্রকৃতি-পরিবেশের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে। **মানুষও একই ভাবে তার অভিযোজন গড়ে তুলেছে। তবে মানুষের ক্ষেত্রটি একটু পৃথক। মানুষ তার নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি এজাতীয় উৎপাদন মূলক অভিযোজন তৈরী করতে বাধ্য হয়েছিল যেখান থেকে ক্রমে পরিবর্তনশীল এক সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা জন্ম নিয়েছিল। এইজন্য মানুষের মেধা ও বুদ্ধি আরও বেশী আলোচ্য হয়ে উঠেছে। অন্যান্য প্রজাতিদের মত যদি মানুষের অভিযোজন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে যেত তাহলে মেধা ও বুদ্ধির প্রয়োজন হোত না। অতএব অন্যান্য প্রজাতি থেকে মানুষের বুদ্ধি মেধা কেন বেশী এবং মানুষের মধ্যেও আবার কারো কারো মেধা-বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত বেশী তার কারণ -নিহিত রয়েছে মানুষের পরিবর্তনীয় (Variable) সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে। পরিবর্তে জিন বা মস্তিষ্কের ঘাড়ে বুদ্ধি, মেধা ও প্রতিভার মত বিষয়গুলির দায় -দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারলে মানুষের মধ্যেকার বিভিন্ন বিভেদগুলিকে সামাজিক ব্যবস্থা নিরপেক্ষ হিসেবে তুলে ধরা অনেক সহজ এবং পাশাপাশি শ্রেণী শোষণকে মান্যতা দেওয়া আরও সহজ।**